রক্তিম বিষয়ে আলোচনা
(১৯৯০) (19)

পূর্ণেন্দু পত্রী

অথচ

তোমাকে দেখে অবাক হয়ে যাই বারবার।

এত আক্রমণ
পরস্পরবিরোধী এত শোকমিছিলের মধ্যেও
কী অনায়াসে বুনে যাচ্ছ লাল পশমের শৃঙ্খলা।
উদ্ভিদের চেয়ে নীরব,
ছাপানো মহাভারতের চেয়ে উদাসীন।

অথচ
পিছনের দেয়ালেই রক্তছাপ
অথচ
বুকের শাড়ি সরালেই
অনাবৃষ্টির চৌচির।

আগুনে আঙুল রেখে

আগুনে আঙুল রেখে ঠায় বসে আছি
কেউ ডাকলে যাতে সাড়া পায়।

ঘরের বাইরে গোল সার্কাসের মাঠ।
নিরাপত্তা-বিধায়ক যথারীতি ভেজানো কপাট।

কবে বৃষ্টি হয়েছিল
তারই বাসি গন্ধ শোঁকে মাটি।
বুদ্ধিজীবী বাতাসের চতুষ্পাঠী চেপেছে নিলামে।
মুখ-আঁটা গোপনীয় খামে
চিঠি চালাচালি চলে সন্ধি ও সংগ্রামে।
ছুঁচের সেলাই ছেঁড়া শার্ট
দুমড়ে মুচড়ে যেভাবে বাতিল
তার চেয়ে হীনমন্যতায়
রৌদ্র আজ লোকালয় ছেড়ে ছুড়ে চলে যেতে চায়
জঙ্গলে ও ইলেকট্রিক খুঁটির ওপারে।
ঘরের বাইরে সব।
ঘর ফাঁকা, ঘরে শুধু পেরেক রয়েছে,
স্মরনীয়তাজ ছবি নেই।
আগুনে আঙুল রেখে বসে আছি ঠায়
সঠিক ঠিকানা খুজেঁ কেউ এলে যাতে সাড়া পায়।

আত্মসমালোচনা

এও এক ধরনের অসুখ
এ বোধ, অতৃপ্তির আর অসম্পূর্তার।
এর জ্বরও ওঠে, নামে, কাঁপায়।
গভীর বৃষ্টিতে ভিজে ঘরে ফেরার পর
এও হয়ে যায় হাড়-পাঁজরের কফ-কাশি।

ভীষণ টঙ্কারের মতো মুহূর্তগুলো
যা বাজে তার ভিতরকার গণনাহীন কাঁপনগুলোকে
চিনিয়ে দিতে, আর ধরার আগেই মিলিয়ে যায়
ক্রমশ দূর প্রতিধ্বনিহীনতায়
হৃতসর্বস্ব হতে হতে।

আমি কি ধরিত্রীযোগ্য

আমি কি ধরিত্রীযোগ্য?
এই প্রশ্নে কেঁপে ওঠে তার
অসুখের ঘূণ-লাগা শরীরের অসি'-মজ্জা হাড়।
তাকে ঘিরে আছে মেঘ
তাকে ঘিরে ব্যাধের উল্লাস।
অক্ষর অন্বিষ্ঠ তার,
হাতের মুঠোয় মরা ঘাস।

প্রকৃতির হাত থেকে মানুষ নিয়েছে কেড়ে নিজের থাবায়
সংক্রামক কুয়াশা ও হিম
মানুষের হাত থেকে কখন নিয়েছে কেড়ে বিরক্ত সময়

অন্ধকার চিনবার মঙ্গল পিদিম।
কাঁটায় ছিঁড়েছে হাত
লুকনো রক্তের ফোঁটা লেগে
পান্ডুলিপি ভিজে একাকার।
আমি কি ধরিত্রীযোগ্য?
এই প্রশ্নে সে এখন সেতারের ছিঁড়ে যাওয়া তার।

একটি দুটি তিনটি যুবক

কলকাতা শহরে মাত্র একটি দুটি তিনটি মানুষ
এখনো যুবক হয়ে আছে স্বেচ্ছাচারে।
ফুটবলের মতো তারা
কারো পায়ে থাকে না কখনো।
ক্রিকেট ব্যাটের মতো
ঘূর্ণি বলে যৌবনের জৌলুস হাঁকায়।
একেকটি শীত আসে
একেকটি যুবক খসে পড়ে।
উল্কাবৃন্তচ্যুত তারা আকাশের কিনারা হারিয়ে
সরপুটি, চাঁদা পুটি,
অল্প জলে অতিকায় খেলা।
হে গভীর! এখানে এসো না।
কলকাতার ক্ষণপ্রভ ভিড়ে এলে তুমিও হারাবে

আতরদানের শিশি, চশমা ও উষ্ণীষ।
তৃণীর মরচেয় গুড়ো হবে।

কিংবা এসো, এসে দেখে যাও
করাতকলের পাশে একটি দুটি তিনটি যুবকের
অগ্নিসাক্ষী রাখা অহঙ্কার।

করাত কেটে চলেছে

করাত কেটে চলেছে ভিতরে
বাইরে তুলকালাম পিকনিক।
অস্ত্রাঘাতের শব্দে শিউরে উঠল কে?
বাতাস।
এক শ্মশান থেকে আর শ্মশানে ছুটছে কে?
যৌবন।

করাত কেটে চলে ভিতরে
বাইরে তুলকালাম পিকনিক।

পায়ের তলায় গুমরে গুমরে উঠছে কি?
প্লাবন।
মাটির দেয়ালে ক্রমশ লতিয়ে উঠছে কি?
মড়ক।

করাত কেটে চলছে ভিতরে
বাইরে তুলকালাম পিকনিক।

কে?

দরজা খোলা
আর দরজা বন্ধের শব্দ।

কে হাঁটো?
লাল নকশো পাড়ে
বিবেচনাহীন ঝাঁপিয়ে পড়ার ঢেউ।
কে হাসো?
দেয়াল ভরে যায়
খাজুরাহোর অলৌকিকে।
কে টালমাটাল করো
স্মৃতির ওয়ার্ডরোব?
উত্তর নেই।

দরজা খোলা
আর দরজা বন্ধের শব্দ

কোন্ কথা মন্ত্র হবে

কোন কথা মন্ত্র হবে কেউ তা জানে না।
তবু তো ঘুমের কাছে বেচে দিতে পার না সিন্দুক।
কঠিন মৃগয়া ছেড়ে বিছানার বালিশে-তোশকে
লুকোতে পার না ধনুর্বাণ।
যেহেতু নিয়েছ বেছে ব্যাধের ভূমিকা
তোমাকে তো যেতে হবে দুর্গমের গূঢ় অভ্যন্তরে
সময়ের শতজট, ভূল-হাতছানি ভেদ করে।

যে কোনো তপস্যা চায়
নতজানু শুচিতা ও শ্রম।

গাছ

রাজকোষের মতো বোঝেই
কুঁড়িতে, পাতায়, শতপুষ্পে, গন্ধের পেখমে।
তবু শিকড়ের চোখে আত্মগোপনকারী যোদ্ধার আত্মসমালোচনা।
নিজের ভিতরে গভীর কোনো জল-উৎস খুঁজতে খুঁজতে
খুঁড়তে খুঁড়তে ক্লান্ত এবং
বিপদাপন্ন।
কখনো কখনো সোনালি মেঘের শিরা-উপশিরাও
তার কাছে করাতের দাঁত।

কখনো কখনো মেঘ সে নিজেই।
মেঘের ভিতরে নিজেকে দীর্ণ করতেই বানিয়ে চলেছে
বজ্র-ডমরুর গুরুগুরু।

গায়ত্রী মন্ত্রের আলো

কবিতা লেখার রাত
ভিজে গেছে অঘ্রাণের উদাসীনতায়।
সব ক্ষীপ্র অত্যুৎসাহে
উদ্যোগে ও কর্মকান্ডে আজ লেগে আছে
শিশিরের সাদা ফোঁটা
জল বসন্তের গুচ্ছ বীজ।

সাদা বালি, লাল বালি
বারুদ গুড়োর গুঢ় বালি
চরাচর থেকে উড়ে আমাদের জানালার গায়।
বিস্ফোরণে পুড়ে পুড়ে বাতাসের নীল কন্ঠনালী
তবু ন্যায়-নীতি মেনে কি জানাতে চায়
শুনে রাখা ভাল।

পায়ে রক্তদাগ,
সূর্যে রাহুর দাঁতের কালো ছায়া।
সন্ত্রাসের মেঘ চিরে
প্রসবব্যাথার চোখে নক্ষত্রেরা তাকিয়ে রয়েছে

কবিতার দিকে,
গায়ত্রী মন্ত্রের আলো চেয়ে।

তোমার মুখের দিকে

প্রণাম করব। কিন্তু পা কই? আগুনে ও হিমজলে পা ডুবিয়ে
এখনো তো তাঁর অফুরাণ হাঁটা
বরণ করব। কিন্তু কই সে শব্দদল যা ছুঁতে পারে
তাঁর বোধের এলাকা?

তাহলে?
জ্বলন্ত সিড়ি ভেঙে ভেঙে শিখরের দিকে যাঁর এগিয়ে চলা,
অনুজের অভ্যর্থনা কীভাবে পৌঁছবে সে অগ্রজে?
তবে কি বিশেষণ-বিড়ম্বিত স্তব কোলাহলেই শেষ হবে সে আরতি?

না। ভীষণ নীরবে চাইব এই খবরটুকু পৌঁছে দিতে শুধু-
আরো দীর্ঘতর প্রতীক্ষায় আমরা প্রস্তুত।
আরো নতুনতর বিস্ফোরণের আলোয়
উত্তাপে আবীরে ঘোর লাল হয়ে উঠুক আমাদের আকাশ।

আমরা তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে।
তুমি মুখ ঘুরিও না।
যজ্ঞাগ্নির সামনে কী দিব্য তোমার দহন!

তোমারই সঙ্গে

তোমারি সঙ্গে যুদ্ধ প্রহরে প্রহরে
তোমারই সঙ্গে সন্ধি,
তোমারই মূর্তি নির্মাণে আমি নিজেকে
করেছি পাথর চূর্ণ।
সর্বনাশের পাশা নিয়ে খেলা দুজনের,
অথচ লক্ষ্য শান্তি।
আক্রমণের তীর ও ধনুকে জ্বলছে
ক্ষমার সৌরদীপ্তি।

তোমার মৃত্যু যখন আমার কান্নায়
তুমি উল্লাসে পদ্ম,
আমার মৃত্যু যখন তোমাকে ছিঁড়ছে
আমি মুখরিত শঙ্খ।

প্রহরে প্রহরে নিহত হয়েও আমরা
অগ্নিপালকে রক্তিম,
পরস্পরের নিঃস্বতা পরিপূরণে
অর্জন করি প্রজ্ঞা।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রখর তুলির পাশে কতদিন অবনত হয়েছি বিস্ময়ে।
এ কী টান! বিদ্যুতের চেয়ে দ্রুত এ কী বলবান

রেখার সংহত রূপ, রেখা যেন গর্বিত গান্ডীব,
যেন জানে শত্রুপক্ষ, যেন জানে কোথায় সংগ্রাম
এবং বিষাদও জানে, হাহাকারে সঙ্গী হতে জানে।

তখন দিগন্ত ছিল রক্তে ও রক্তিম আকাঙ্খায়
একই সঙ্গে একাকার, দুঃসময় ঘরে ও বাহিরে।
বিশ্বাসের দুর্গ ভাঙে, অবিন্যস্ত বাতাসে ছড়ায়
প্রশ্ন শুধু, প্রশ্ন বীজ প্রশ্ন বৃক্ষ হয়।
সেই দীর্ণ সময়ের দিনগুলি, দগ্ধ রাতগুলি
একটি তুলির কাছে যখনই চেয়েছে বরাভয়,
পেয়েছে বুকের বর্ম, মানচিত্র, দৃপ্ত যাত্রাপথ।

তাঁর কোনো নামাবলী নেই, তিনি নিঃসঙ্গ পথিক
ভ্রমণ বিলাসী তিনি, দুর্গমে দুরুহে নিত্য পাড়ি।
কানাকড়িহীন কিন্তু হাসিতে ঠিকরোয় রত্নকণা,
রাজাধিরাজের মতো এই নিঃস্ব এখনো প্রেরণা।

নতুন শব্দ : সফদার হাসমি

এই মৃত্যুশোক
কাঁধ থেকে নামানো যাবে না কোনোদিন।
আর বর্বরতা কি নির্বোধ।
যেন মৃত্যু হলেই মুছে যায়
প্রতিজ্ঞার প্রাণ।

আক্রমণ কোনো নতুন শব্দ নয়।
হিংসা কোনো নতুন শব্দ নয়।
নতুন শব্দ-সফদার হাসমি।

সফদার হাসমি মানে জাগা,
জেগে থাকা,
জাগানো।

পাহাড় গন্তব্য ছিল

বইয়ের উপর থেকে ধুলো মুছে নিলে
আরো ধুলো রয়ে যায় অক্ষরের স্থাপত্যকে ঘিরে।
ফলে ব্যাঙই সাপ খায় গিলে।

মানুষ যেযার মতো চোখে-ধুলো ব্যাখ্যা দিতে জানে,
সূর্য, শিল্প, শ্রম, শান্তি, শস্য বা সংহতি
আগুন-বীজের মতো এইসব মহাপ্রাণ শব্দেরও সহজতর মানে।

মঞ্চ থেকে যে-মুহূর্তে প্রেরণার যোগ্য সম্ভাষণ
বসন্তের বিস্ফোরণ বাতাসের শিরা ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
কুঠার চিহ্নকে মুছে যুবক-যুবতী সাজে বন।

সে শুধু ঋতুর মতো আসা-যাওয়া, থেকে যাওয়া নয়।
সময়ের ঝাঁট দেওয়া ধুলোর পরত জমে জমে
মানচিত্র পোকা-খাওয়া, বিশ্বাসের অবিশ্বাস্য ক্ষয়।

পাহাড় গন্তব্য ছিল, অবশেষে নুড়ি ঘেঁটে ফেরা।
বিকেলের চশমায় নিশুতি রাতের কালো ছোপ,
অভিযানযোগ্য পথ ইজারা নিয়েছে গহ্বরেরা।
আলো আসে, আলো চলে যায়।
জল থাকে, খুঁটি ধরে টেনে রাখে উচ্ছৃঙ্খল জল,
নিরীক্ষণ স্থির হতে পারে না ডাঙায়।

বিরুদ্ধাচরণ

শিল্পের শৃঙ্খলা ভেঙে, নৈতিকতা ভেঙে
তুমি যদি বায়ুমুখ নৈরাজ্যের কুহকে বাঁকিয়ে
নিজের সিদ্ধিকে ভাবো সভ্যতারই আরও উত্তরণ
বিরুদ্ধাচরণ ব্রত হবে।

যে গেলাসই জল দেয়
ছুঁড়ে ভাযো, অথচ তোমার
জল চাই মুহুর্মুহু,
জল চাই, জলস্তম্ভ চাই।
সমস্ত গেলাস ভেঙে, জলাধার ভেঙে

যদি চাও নিরাপদ সমুদ্র-শোষণ,
বিরুদ্ধাচরণ ব্রত হবে।

তোমার মোহর থেকে ঝলসানো সাফল্য ও সুখ
যে কেনে কিনুক।
আমি শ্রমে অকাতর, আমার নির্মাণ
পেশী পক্ষপাতী।
আমি জানি সৃজনের ভিতরের নিঃশব্দ দহন।

তুমি যদি আগুনের শিখা ও শিকড়
পুষতে চাও পকেটে, লাইটারে
বিরুদ্ধাচরণ ব্রত হবে।

যুদ্ধ

যে আমাকে অমরতা দেবে
সে তোমার ছাপাখানা নয়,
সে আমার সত্তার সংগ্রাম
নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়।

শামসুর রাহমান, ৬০

তোমার মুকুট ঘিরে থাক কাঁটাতারে
বিদ্ধ করুক পেরেকের অপমান।

জানবে তোমার খোঁজ নেয় রোজ গারো পর্বতমালা
কেমন আছেন শামসুর রাহমান?

তোমার তূনীর ভরা থাক বিশ্বাসে
শব্দ বুনুক বজ্রের বীজধান।
হয়তো একদা মেঘে শোনা যাবে মেঘনার তোলপাড়
আমি হতে চাই শামসুর রহমান।

ছেনী ও হাতুড়ী ধরা যাক দৃঢ় হাতে
রূঢ় প্রস্তর খুঁজে পাক গূঢ় প্রাণ।
আজ সকালেই সোনার কলমে সূর্য লিখল রোদে
ইতিহাস হোক শামসুর রাহমান।

সেই পদ্মপাতাখানি

সেই পদ্মপাতাখানি ছুঁয়ে আছি তবু।
যতই ফুঁ দাও ঝড়ে নেভাতে পারবে না
মোমের আগুন।

এত ভুল কর কেন যোগে ও বিয়োগে?
ত্রিশূলের কতটুকু ক্ষমতা ক্ষতির?
নির্বাসনদণ্ড দিয়ে মুকুট কেড়েছ,
তবু দেখ পৃথিবীর পাসপোর্ট আত্মীয় করেছে।

আমার পতাকা উড়ছে
পাখিদের স্বাধীনতা ছুঁয়ে।